বাংলাদেশের সরকারী অর্থ ব্যবস্থা

ইউনিট ৯

পাঠ ১ : স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ণনা দিতে পারবেন
- স্থানীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন
- স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষার্থীরা আপনারা নিশ্চয়ই "প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ" শব্দটির সহিত সবাই কম বেশী পরিচিত। চলুন এবার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ :

প্রশাসন এক হাতে বা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না রেখে জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভাগ করে দেয়াই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। সাধারণ জনগণের প্রশাসনিক কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কল্যাণেই মূলতঃ স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার শব্দ দুটির উৎপত্তি।

স্থানীয় সরকার :

স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কোন রাষ্ট্রকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় এবং এর প্রশাসনের ভার স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের হাত ন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনিক কর্মে নিয়োজিত এই স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণই স্থানীয় সরকার নামে পরিচিত। যেমন : গ্রাম্য মাতব্বর, গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকার :

একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় গুরুদায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং গোটা রাষ্ট্রের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য পুরস্কার বা তিরস্কার যাদের ললাটে বর্তায় তারাই সমষ্টিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নামে খ্যাত। আধুনিক বিশ্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়-দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে তাদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসারিত হয়েছে এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই তা জটিল আকার ধারণ করছে। এই জটিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একযোগে কাজ করছে।

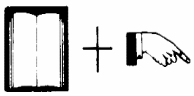

অনুশীলন : স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মনে এই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকার কোন কোন উৎস থেকে আয় করে এবং কিভাবে ব্যয় করে।

আসুন একটু কল্পনা করা যাক্। ধরুন, আপনি গ্রামে বাস করেন। আপনার গ্রাম থেকে শহরে আসার একটা মাত্রই রাস্তা। রাস্তার মধ্যে একটা সাঁকো বেশ কয়েকদিন যাবত ভেঙ্গে পড়ে আছে। সাঁকোটা মেরামত করতে অনেক টাকা লাগবে যা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। হয়ত একদিন আপনার গ্রামের চেয়ারম্যান সেই ভাঙ্গা সাঁকো মেরামতের দায়িত্ব নিলেন এবং মেরামত করলেন। এখন আপনি যদি সাধারণ চিন্তাধারার লোক হন তবে মনে করবেন চেয়ারম্যান তার নিজের টাকায় সেতুটি মেরামত করেছে এবং তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকবে না। কাজটি নিঃসন্দেহে মহৎ এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যে টাকাটা ব্যয়িত হলো সেটা কোথা থেকে এলো একবারও কি আপনি ভেবে দেখেছেন?

চলুন তাহলে এবার প্রথমে স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলি দেখা যাক্।

একটা সময় ছিল যখন গ্রাম সরকার বা গ্রাম্য মাতব্বররাই ছিল গ্রামের মাথা। বিচার আচার থেকে শুরু করে সমাজের সুখ-দুঃখ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা এত জটিল ছিল না। সেই সোনার বাংলাদেশ ছিল ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা ইবনে বতুতার রঙ তুলিতে আঁকা। তাই সেই সময় স্থানীয় সরকারকে তার আয়-ব্যয় নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিল আকার ধারণ করতে লাগল। সাথে সাথে স্থানীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিধি বেড়ে গেল বহুগুণে। স্থানীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের এই আলোচনার উষালগ্নে প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদের কথায় আসা যাক্।

ইউনিয়ন পরিষদ আসলে কি?

পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারী হয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যান ইউনিয়নের সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মোট সদস্য ১৪ জন এবং মেয়াদ ৫ বছর। বর্তমানে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৪৭২টি।

ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এই কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিম্নোক্ত উৎস সমূহ হতে ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করে থাকে।

১. **ঘরবাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের উপর ধার্য কর :** কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইউনিয়ন পরিষদ ঘর-বাড়ি ও জমির আয়ের উপর কর ধার্য করে।

২. **যানবাহনের উপর কর :** রিক্সা, সাইকেল, গরুর গাড়ি, টমটম এবং অন্যান্য যানবাহনের উপর আরোপিত কর হতে ইউনিয়ন পরিষদের আয় হয়।

৩. **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর কর :** হাট-বাজার, খেয়াঘাট, হাওড়, পুকুর, প্রভৃতির লীজ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর মোটা অংকের মুনাফা আয় করে।

৪. **অপরাধী জরিমানা :** অপরাধীর উপর ধার্যকৃত জরিমানা ইউনিয়ন পরিষদের একটি আয়।

৫. **ব্যবসা ও পেশার উপর ধার্য কর :** ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার অভ্যন্তরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কর পেয়ে থাকে এটা ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের একটি অন্যতম উৎস।

৬. **বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ধার্য কর :** বিবাহ, আলোকসজ্জা, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান থেকে ইউনিয়ন পরিষদ কর পেয়ে থাকে।

৭. **বিনোদনের উপর ধার্য কর :** সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, খেলা ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করে।

৮. **লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য কর :** বিভিন্ন ঠিকাদারী লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর পেয়ে থাকে।

৯. **সরকারী সাহায্য :** কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অনুদান বা বরাদ্দ স্থানীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস।

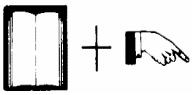

অনুশীলন : উপরোক্ত উৎসগুলো ব্যতীত আরো কিছু আয়ের উৎস নিজে নিজে ভাবুন।

উপরোল্লেখিত আয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নির্বাচনী এলাকার জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যয় করে থাকে।

এবার তাহলে চলুন স্থানীয় সরকারে ব্যয়ের খাতগুলো লক্ষ করা যাক :

১. **জনকল্যাণমূলক কাজ :** স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করে থাকে। যথা – রাস্তাঘাটের সংরক্ষণ ও আলোর ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, গোরস্থান এবং শশ্মান নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কূপ, নলকূপ, ট্যাঙ্ক খনন ও সংরক্ষণ, জন্মমৃত্যুর রেজিষ্ট্রিকরণ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, এতিম দুঃস্থ ও বিধবাদের সাহায্যদান, এতিমখানা পরিচালনা ইত্যাদি।

২. **উন্নয়নমূলক কাজ :** ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষিক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার, সার, বীজ, চারা বিতরণ ব্যবস্থা, পোকামাকড়ের জন্য

কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৩. **জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত :** এলাকায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য স্থানীয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে।

৪. **বিবিধ :** এছাড়া স্থানীয় পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারক, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, লাইব্রেরি ও পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে তার অর্জিত ফান্ড থেকে ব্যয় করে। গ্রামের শান্তি রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজেও অর্থ ব্যয় করতে হয়।

অনুশীলনী : ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নাগরিকরা যে সাহায্য পায় তার সবটা কি তাদের হাতে পৌঁছায় বলে আপনি মনে করেন।

এবার পৌরসভার আলোচনায় আসা যাক্। গ্রামের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন হচ্ছে ইউনিয়ন এবং শহরের ক্ষেত্রে পৌরসভা। কাজেই আমরা বলতে পারি ইউনিয়ন ও পৌরসভা একই জিনিসের দুটি ভিন্ন নাম মাত্র। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা মেম্বার নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কমিশনার নামে পরিচিত। শহরের জনসাধারণের আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভা বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিম্নলিখিত উৎসগুলো হতে আদায় করে থাকে :

১. পৌরসভায় বসবাসরত জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের বাড়িঘর ও জমির আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়।

২. পৌরসভায় যানবাহন চলাচলের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং এই অনুমতি বাবদ পৌরসভা একটি নির্দিষ্ট ফি যানবাহনের মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে।

৩. বিবাহ, ভোজ, আলোকসজ্জা প্রভৃতির জন্য পৌরসভাকে কর দিতে হয়।

৪. সরকারী বিভিন্ন খাস জমি থেকে পৌরসভা প্রতি বছর প্রচুর অর্থ আয় করে।

৫. নাটক, থিয়েটার, মেলা প্রভৃতি বিনোদনের জন্য পৌরসভার অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পৌরসভাকে প্রদান করতে হয়।

৬. পৌরসভার ভিতরে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, জলমহল প্রভৃতি আছে এদের কাছ থেকে প্রতিবছর কর বাবদ প্রচুর অর্থ পৌরসভা আয় করে।

৭. পৌরসভার মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ মন্দির প্রভৃতি নির্মাণে সরকারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পৌরসভা পেয়ে থাকে। এটা পৌরসভার আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৮. পৌরসভা বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট বাবদও আয় করে থাকে।

৯. পৌরসভার মধ্যে গোরস্থান, পুকুর, খেয়াঘাট, হাটবাজার, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি থেকে ইজারা বাবদ স্থানীয় সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

অনুশীলনী : পৌরসভার আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উৎস আলোচনা করুন।

পৌরসভা শহরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য তার অর্জিত অর্থ নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে থাকে :

১. শহরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পৌরসভা সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রভৃতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

২. পৌর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয় তার ব্যয়ভার পৌরসভাকেই প্রদান করতে হয়।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত আর্তমানবতার সেবায় পৌরসভাকে এগিয়ে আসতে হয় ও সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

৪. পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনামূল্যে বই ও বৃত্তি প্রদান খাতে পৌরসভাকে ব্যয় বহন করতে হয়।

৫. সরকারী জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ পার্ক উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৬. গরীব-দুঃখী ও দুঃস্থদের জন্য কল্যাণকেন্দ্র, অনাথ আশ্রম, নিঃসম্বল ব্যক্তিদের মৃতদেহের সৎকার প্রভৃতিতে পৌরসভাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

৭. পৌরসভা শহর এলাকায় জাদুঘর, আর্ট গ্যালারী, মিলনায়তন, গ্রন্থাগার, মুক্ত মঞ্চ ইত্যাদি স্থাপন করে।

৮. বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা পৌরসভার কাজ। পানি নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

৯. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারি স্থাপনে পৌরসভা অর্থ ব্যয় করে থাকে।

১০. শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনে টাস্কফোর্স গঠন করে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ থাকে।

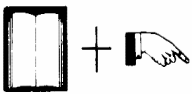

অনুশীলন : ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

এবার চলুন কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার কার্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এই কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার তার এই প্রয়োজনীয় অর্থ মূলতঃ কর এবং কর বহির্ভূত খাত থেকে আদায় করে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান খাতসমূহ আলোচনা করা হ'ল।

১. **আয়কর :** আয়কর সরকারী আয়ের একটি বর্ধমান উৎস। জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর এ কার্য করা হয়। যাদের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকার উপরে, তাদেরকে আয়কর দিতে হয়।

২. **ভূমি রাজস্ব :** কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হল ভূমি রাজস্ব। স্বাধীনতার পর ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করায় এ খাতে আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৩. **মূল্য সংযোজন কর :** দেশের পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের ভিত্তিতে এ কর ধার্য করা হয়। এটি একটি পরোক্ষ কর। এটি সংক্ষেপে ভ্যাট নামে পরিচিত।

৪. **বাণিজ্য শুল্ক :** বাণিজ্য শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস। সাধারণতঃ আমদানি-রপ্তানির উপর এই শুল্ক ধার্য করা হয়।

৫. **আবগারী শুল্ক :** চা, চিনি, তামাক, সিগারেট, দিয়াশলাই, কেরোসিন, ঔষধ, প্রসাধনী প্রভৃতির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আবগারী শুল্ক ধার্য করে।

৬. **স্ট্যাম্প :** বিভিন্ন দলিল, মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির উপর স্ট্যাম্প বসাতে হয়। স্ট্যাম্প বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আয় করে থাকে।

৭. **রেজিস্ট্রেশন :** বিভিন্ন দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করতে হলে সম্পত্তির মূল্যের উপর সরকারকে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়।

৮. **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান :** এসব প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হিসেবে গণ্য।

৯. **রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প :** স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে যেগুলো এখনও সরকারী মালিকানায় রয়েছে সেগুলো থেকে সরকারের আয় হয়।

১০. **সুদ :** কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারীদের সুদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

১১. **ডাক, তার ও দুরালাপনী :** ফোন, ফ্যাক্স ও ডাক বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব আয় করে থাকে।

১২. **যাতায়াত :** যাতায়াত খাতে রেলওয়ে ও বিআরটিসি দীর্ঘদিন লোকসানী খাত ছিল। গত বছর রেলওয়ে খাতে আয় হয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা। আর বিআরটিসি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়াতে এটা বর্তমানে সরকারের লাভজনক খাতে পরিণত হয়েছে।

১৩. **বন :** বন যে কোন দেশের জাতীয় সম্পদ। বনাঞ্চল থেকে বাঁশ, কাঠ, মধু ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় করে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকার কিছু না কিছু আয় করে।

১৪. **যানবাহন :** কেন্দ্রীয় সরকার যানবাহন থেকে কর আদায় করে।

এছাড়াও প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর, সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণের কর, সেচ কর, অপরাধীদের অর্থ দন্ড প্রভৃতি উৎস হতে আয় করে থাকে।

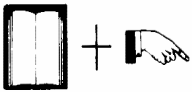

অনুশীলন : কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎসগুলো থেকে প্রাপ্য আয়ের সবটা সংগ্রহ করতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি না পারে তবে কেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের খাত :

১. **প্রতিরক্ষা :** কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল প্রতিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী দরকার। তাই সামরিক

বাহিনীর বেতন, ভাতা প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রতিবছর সরকারী বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয়।

২. **বেসামরিক প্রশাসন :** বেসামরিক শাসন কার্য পরিচালনার জন্য রাজধানী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটা বিশেষ অংশ ব্যয় হয়।

৩. **শিক্ষা :** বর্তমানে শিক্ষার উপর বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ১৯৯৮-৯৯ এর বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে ৪ হাজার ৫ শত ৯৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

৪. **স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা :** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

৫. **পুলিশ :** অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীর বেতন ভাতা ৩০% বাড়ানো হযেছে।

৬. **রাইফেলস :** দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান রোধের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনী (বিডিআর) গড়ে তুলেছে।

৭. **বিচার ও কারা বিভাগ :** দেশের সর্বত্র বিচার বিভাগ পরিচালনা এবং কারাগারগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী ব্যয় আবশ্যক।

৮. **বেসামরিক পূর্ত কাজ :** সরকারী ভবন, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ সরকারকে অর্থ সাহায্য দিতে হয়।

৯. **রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান :** আয়কর বিভাগ, বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা অংকের অর্থ সরকারকে ব্যয় করতে হয়।

১০. **ঋণ ও সুদ পরিশোধ :** উন্নয়নমূলক কাজের সরকার কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে যে ঋণ নেয় তা সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হয়।

১১. **সমাজ কল্যাণ :** জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে পার্ক, স্টেডিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে। এগুলোর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

১২. **অপ্রত্যাশিত ব্যয় :** যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে সরকারকে দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

এসব ব্যয় ছাড়াও বিদেশে দেশের দূতাবাস স্থাপন ও পরিচালনা, সরকারী কর্মচারীদের বোনাস, অবসরভাতা, বিনোদন ভাতা, ভর্তূকি, সাহায্য, মঞ্জুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

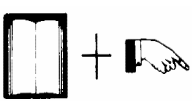

অনুশীলন : কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের খ্যাতগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. স্থানীয় সরকারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২. স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো বর্ণনা করুন।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো বর্ণনা করুন।

৪. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত ?

ক. ৪৪২৭ টি　　খ. ৪২৪৭ টি

গ. ৪৪৭২ টি　　ঘ. কোনটিই না

২। মূল্য সংযোজন কর আসলে –

ক. প্রত্যক্ষ কর　　খ. পরোক্ষ কর

গ. আয়কর　　ঘ. সুদ

৩। স্থানীয় সরকারের ব্যয়ের খাত কোন্‌টি ?

ক. প্রতিরক্ষা　　খ. শিক্ষা

গ. প্রশাসন　　ঘ. জনকল্যাণ

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের একটা বিশাল অংশ ব্যয় হয় –

ক. সমাজকল্যাণ　　খ. প্রতিরক্ষা

গ. শিক্ষা　　ঘ. প্রশাসন

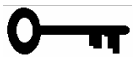

সমস্যা :

ধরুন বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দেশের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবে। এই অবস্থায় –

ক) আপনার কি মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার আগের মত দক্ষতার সাথে তার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

খ) যদি না পারে তবে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে?

গ) স্থানীয় প্রশাসন ব্যতীত এই সমস্যা থেকে সমাধানের উপায়গুলো বের করুন।

পাঠ—২ : বাংলাদেশে সরকারী আয়ের উৎস সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারী আয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- সরকারী আয়ের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন
- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস সমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা :

একটি দেশের সরকারী আয়ের উৎস ও পরিমাণ এবং সরকারী ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ নির্ভর করে দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। তবে প্রতিটি দেশের সরকারের আয়-ব্যয়ের কিছু সাধারণ উৎস এবং খাত রয়েছে। আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাতসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ভর করে দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা, উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ, কর ব্যবস্থার দক্ষতা, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত প্রভৃতির উপর। বর্তমান পাঠে আমরা সরকারী আয়ের উৎসসমূহের বর্ণনা করব।

সরকারী আয়ের উৎসমূহ :

প্রত্যেকটি সরকারকেই দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার-কার্য, প্রতিরক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য কর ও কর বহির্ভূত খাত থেকে সরকার অর্থ আয় করে থাকে। এ আয়ই সরকারী আয় হিসেবে পরিচিত। সরকারী আয়ের উৎস দু'টি।

১. কর থেকে আয় এবং

২. কর বহির্ভূত খাত থেকে আয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশকেও বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থ আয় করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের কর বাবদ অর্জিত আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলো বর্ণনা করা হ'ল।

আয়কর : জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য হয় তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশে যাদের আয় বার্ষিক ৬০ হাজার টাকার উপরে তাদেরকে আয়কর দিতে হয়। আয়কর সরকারী আয়ের একটি বর্তমান উৎস।

বহিঃশুল্ক : আমদানি-রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্ককে বহিঃশুল্ক বলে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে এ খাতে বাংলাদেশ ৪৪১০ কোটি টাকা আয় করেছে।

অনুশীলন : সরকারী আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি (কর থেকে)।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় : রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ সাধারণ বীমা কর্পোরেশণ প্রভৃতি সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস। তবে এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় স্থিতিশীল নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বন বিভাগ : বন বিভাগ থেকে সরকার প্রতি বছর কিছু না কিছু আয়-অর্জন করে থাকে। ১৯৯২/৯৩ এবং ১৯৯৩/৯৪ সালে এ উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ৪২ কোটি টাকা।

তার ও টেলিফোন : তার ও টেলিফোন সরকারী রাজস্ব আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৬৫৯ ও ৭৫০ কোটি টাকা আয় করে।

সুদ : সরকার বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। এ সব বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রদানকৃত ঋণ থেকে সরকার সুদ হিসেবে আয় অর্জন করে থাকে। ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সুদ হতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৫০ ও ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৯৭/৯৮ সালের বাজেটে এ খাতে ৩.৭% প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

জরিমানা : দেশের আইন ভঙ্গকারীদের নিকট হতে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করা হয় এবং এটা বাধ্যতামূলক।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম : বন, মৎস্য, সেচ এবং পশু সম্পদ খাতে প্রাপ্তি বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৮.৮% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে এ খাতে প্রায় ১১% প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা : দুঃস্থদের জন্য বিশেষ কল্যাণমূলক অনুদান খাতে ৫০ কোটি টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বিশেষ অনুদান ১২ কোটি ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ধার্য করা হয়েছে। এ খাতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৪৩ ও ১৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

ডাক বিভাগ : ডাক বিভাগে প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার বিপুল অংকের ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ১৯৯৫/৯৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি টাকা।

যোগাযোগ ও পরিবহন : পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ৬৮ ও ৭৪ কোটি টাকা আয় করেছে।

বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক : বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানী স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে প্রতিবন্ধক। বিলাসজাত দ্রব্য এবং কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানীর উপর আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর বৃদ্ধি করলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়বে।

সরকারী ঋণ : সরকারের স্বাভাবিক আয় যখন ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তখন সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট হতে অথবা বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়।

রেলওয়ে : বাংলাদেশ রেলওয়ে মূলতঃ সরকারের একটি ভর্তুকি প্রাপ্ত খাত। এর ব্যর্থতার জন্য মালিকানা দায়ী নয় বরং ব্যবস্থাপনাগত অব্যবস্থাই দায়ী। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে রেলওয়েতে যেখানে লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৫৯ কোটি টাকা, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সেখানে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা।

বাণিজ্যিক আয় : জনসাধারণের মত সরকারও নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যেমন – ডাক, তার, টেলিভিশন, বিমান, রেল প্রভৃতি। এছাড়া যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয় সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠান হতে সরকার প্রতি বছর প্রচুর আয় করে।

বঙ্গবন্ধু সেতু সারচার্জ ও লেভী : বাংলাদেশের মানুষের কল্পনার বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু। ১৯৯১/৯২ অর্থ বছরে সরকার বঙ্গবন্ধু সেতুর সারচার্জ বাবদ ৮০ কোটি টাকা আয় করে।

অন্যান্য উৎস : উপরোক্ত উৎসগুলো ছাড়াও সরকার প্রমোদ কর, সম্পত্তি কর, দান কর, বিদ্যুৎ কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর আয় করে থাকে। ১৯৯০/৯১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৯৩.৯৪ কোটি টাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামুলক প্রশ্ন :

১. সরকারী আয় কাকে বলে? সরকারী আয়ের উৎস কি কি?
২. কোন দেশের অর্থনীতিতে সরকারী আয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর বিবরণ দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সরকারী আয়ের উৎস নির্ভর করে দেশের –
ক. রাজনৈতিক অবস্থার উপর খ. অর্থনৈতিক অবস্থার উপর
গ. আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ঘ. সামাজিক অবস্থার উপর

২। বাংলাদেশের সেই সব জনগণ আয়কর দিয়ে থাকে যাদের আয় –
ক. ৫৫ হাজার টাকার উপরে খ. ৬০ হাজার টাকার উপরে
গ. ৫৮ হাজার টাকার উপরে ঘ. ৬৫ হাজার টাকার উপরে

৩। সিগারেট ও ঔষধের উপর ধার্য করা হয় –
ক. আবগারী শুল্ক খ. মাদক শুল্ক
গ. সম্পূরক শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৪। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কোন্‌টি?
ক. রেলওয়ে খ. কৃষি
গ. আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা :

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ উৎস লিপিবদ্ধ করুন। এবার ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর ধরে ১৯৯৭-৯৮ এর বাজেটের আলোকে এই উৎসগুলোর কতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে তার শতাংশিক হিসাব নির্ণয় করুন।

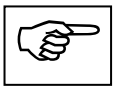

পাঠ — ৩ : বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কর কাকে বলে জানতে পারবেন
- উত্তর কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বর্তমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা কতটা সন্তোষজনক সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর কাঠামোতে কি ধরনের পরিবর্তন আবশ্যক সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা কর ও এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিশদ জেনেছেন। চলুন আমরা একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি আসলে কর কি? সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হল কর। জনসাধারণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। এর জন্য সরকার কর প্রদানকারীকে সুবিধা দিতে বাধ্য নহে বা এর জন্য নাগরিক সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোন সুবিধা দাবী করতে পারে না কিন্তু কর প্রদান করতে সে আইনত বাধ্য থাকে। করের অর্থ সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয়। মোট সরকারী রাজস্বের প্রায় ৮০ শতাংশ কর থেকে আগে এবং অবশিষ্ট ২০ শতাংশ আসে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে। তাই যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য একটি উত্তম কর ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী :

যে কর পদ্ধতিতে করের আইন কানুনগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তাকে উত্তম কর ব্যবস্থা বলা হয়। এই আলোকে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

১. করদাতাগণের সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য করাই আদর্শ কর ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির উপর কোন সরকার কর ধার্য্য করবে না।

২. কর বন্টনে সরকারকে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করতে হয়। সর্বাপেক্ষা কম ত্যাগ স্বীকার করার নীতি দ্বারাই কর ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। এমনভাবে কর ধার্য্য করা উচিত সমাজে গড় ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হয়। এজন্য সমানুপাতিক হার অপেক্ষা প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করা উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

৩. সরকারের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর রাজস্বের প্রয়োজন হয়। তাই উৎপাদনশীল খাতে কর ধার্য্য করা উচিত যা হতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব। তবে কর ধার্যের ফলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সরকারকে যত্নবান হতে হবে।

৪. কর আদায়ে যাতে খরচ কম হয় সেদিকে সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে। কর আদায়ে অত্যধিক খরচ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

৫. কি পরিমাণ এবং কোন সময়ে কর ধার্য্য করলে করদাতা ও সরকারের বাজেট প্রণয়নে সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এমন কর ধার্য্য করা উচিত যা নিশ্চিতভাবে প্রতিপালিত হয়।

৬. একই পরিমাণ কর বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় করা যেতে পারে। কিছু কিছু পদ্ধতি আছে যার ফলে করদাতাদের কর প্রদানের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আবার কিছু পদ্ধতি আছে যাতে তারা কম অসুবিধা ভোগ করে। যে পদ্ধতিতে কর আদায় করলে করদাতার উপর চাপ কম পড়ে তাই আদর্শ করা আদায় পদ্ধতি।

৭. উত্তম কর ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার কর থাকা বাঞ্ছনীয়। কর কাঠামোতে উভয় প্রকার কর বর্তমান থাকলে একে অপরের অসুবিধাসমূহ কিছুটা নিষ্ক্রিয় করতে পারে এবং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮. একটিমাত্র কর বা অসংখ্য কর ধার্য্য না করে কতিপয় কর ধার্য করা কর ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটিমাত্র কর যেমন খুব উৎপাদনক্ষম নহে তেমনি বহুবিধ কর ধার্য করলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমন কতগুলি কর ধার্য করা প্রয়োজন যাতে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয় অথচ কর ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

৯. কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। এমন কর ধার্য করা উচিত যাতে প্রয়োজনে করের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সুতরাং যে কর ব্যবস্থা সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে এবং উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তা আদর্শ কর ব্যবস্থা।

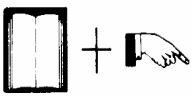

অনুশীলন : আদর্শ কর ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আপনাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে যে, উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ? চলুন তাহলে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি।

প্রত্যেক দেশের করনীতির কিছু সাধারণ লক্ষ্য থাকে। যথা –

- রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।
- মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা ও মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।
- সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- অবাঞ্ছনীয় পণ্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা।
- জনসাধারণকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা।

এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে আলোকপাত করলে বাংলাদেশের কর কাঠামোকে মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না।

বাংলাদেশের বর্তমান কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটিসমূহ :

কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক নয় : বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত খুবই কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ১৯৭৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ছিল ৭.৫ ভাগ ১৯৮০ সালে এ অনুপাত দাঁড়ায় ৮ ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১৭১২০ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৪ শতাংশ বেশী। একই অর্থ বছরে রাজস্ব বোর্ডের আওতায় কর সমূহ হতে রাজস্ব প্রাপ্তি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩০৪০ কোটি টাকা যা পূববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৪ শতাংশ বেশী। তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত অনেক কম।

প্রত্যক্ষ করের অবদান কম : পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিক প্রগতিশীল এবং করভার বন্টনে অনেকটা সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিক নমনীয়। এসব কারণে একটি নির্দিষ্ট দেশের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের অংশ খুবই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ৬৪ ভাগ, কানাডায় ৬৬ ভাগ, বার্মার ৫০ ভাগ, সুইডেনে শতকরা ৪৫ ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করের অংশ মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন বীমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অনিবাসী কোম্পানি সমূহের ক্ষেত্রে আয়করের হার ৪৭.৫০% থেকে হ্রাস করে ৪৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের কর অব্যাহতি সীমা ৫৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অগ্রীম আয়করের হার ০.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বোনাস শেয়ার বিক্রয় লব্দ মূলধন আয়কে সম্পূর্ণরূপে কর অব্যহতি দেয়া হয়েছে। যাদের আয়ের উৎস শুধু কৃষি তাদের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের সীমা ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীলতা : আমাদের দেশের কর রাজস্বের শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগই পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়। পরোক্ষ করের সিংহভাগ আসে বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও বিক্রয় করের মত কয়েকটি উৎস হতে। মোট পরোক্ষ করের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে বাণিজ্য শুল্ক ও আমদানীর উপর আরোপিত বিক্রয় কর থেকে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে আমদানী শুল্কের সর্বোচ্চ হার ৫০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। কৃষি, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, হাঁস-মুরগী, বস্ত্র ও পরিবহন খাতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প উৎসের ব্যবহার করার লক্ষ্যে জেনারেটর ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর উপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। নির্মাণ সংস্থা, রপ্তানী শিল্প ও ইট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক দাখিল পত্রের বিধান চালু করা হয়েছে।

করের ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত নয় : বাংলাদেশের কর কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে করের ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। উন্নয়নশীল দেশের কর কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, এ সকল দেশের করভার বিভিন্ন খাত ও উৎসের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয় না। বাংলাদেশের কর কাঠামো পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন খাত ও উৎসের মধ্যে কর ভারের অসম

বন্টন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ হলেও মোট কর রাজস্বে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ মাত্র।

কর কাঠামো প্রগতিশীল নয় : সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কর কাঠামো প্রগতিশীল নয়। আমাদের কর ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের অনুপাত বেশী থাকায় করের ভার সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকেই বেশী বহন করতে হয়। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর কিছুটা প্রগতিশীল হলেও ভূমিকর, সম্পদ কর ইত্যাদির মত কর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অধোগতিশীল। সুতরাং কোন কোন কর এককভাবে প্রগতিশীল হলেও সামগ্রীকভাবে আমাদের কর ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রগতিশীল নহে। এ কারণে আমাদের দেশের করের বোঝা সাধারণ ক্রেতাদেরকেই বেশী বহন করতে হয়।

বিভিন্ন দিক হতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের করের ভিত্তি যেমন-সংকীর্ণ তেমনি কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা কম এবং এর প্রশাসনিক কাঠামো খুবই দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কর কাঠামোকে মোটেই শক্তিশালী বলা যায় না।

অনুশীলন : বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার এই ত্রুটিসমূহ কি কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন।

বাংলাদেশ সরকারকে মোট জাতীয় আয়ের ৯৭% সংগ্রহ করতে হয় এবং সরকারী বিনিয়োগের ৯৩ শতাংশের দায়িত্ব তার ঘাড়েই বর্তায়। কিন্তু বাংলাদেশের গতানুগতিক জাতীয় আয় ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।

----- এর চরিত্র মূলত :

- উচ্চ এবং অসম আমদানী শুল্ক।
- বিভিন্ন খাতে উচ্চ কর ব্যবস্থা।
- যৌথ এবং ব্যক্তিগত আয় কর ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ।

তাই বাংলাদেশ সরকার তার গতানুগতিক কর ব্যবস্থা সংশোধন করার লক্ষ্যে এবং দেশীয় করের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে কর ব্যবস্থাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কর ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নতি সাধিত হয় মূলত: ১৯৯১ সালে। এই সময় কর পদ্ধতিতে ভ্যাট সংযুক্ত করা হয়। এই ভ্যাট এর ফলে ১৯৯০ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ যেখানে ৯.৩% ছিল সেখানে ১৯৯৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২%। কিন্তু এই হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের তুলনায় কম। শ্রীলংকায় এর পরিমাণ ১৯.৭%, পাকিস্তানে ১৮.৪% এবং ভারতে ১৯.১%। তাই বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ মোট জিডিপি এর ০.৫% হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং জাতীয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ যে কোন দেশের রাজস্ব বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ কর মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বিপরীত। এই বিপরীতমুখী প্রবণতা দূর করে প্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে কর রাজস্বে সিংহ ভাগই প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়। করভার বন্টনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিকতর সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ কর অধিক স্থিতিস্থাপক। সুতরাং আমাদের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের পরিধি ও ভিত্তি আরও জোড়ালো ও বিস্তৃত করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়। দেশের প্রায় অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত এবং তারা ক্ষমতার দাপটে কর ও অন্যান্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ফলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং গরীবরা নিঃস্ব হচ্ছে। এই অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা আরও প্রগতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, রপ্তানী, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি একটি প্রতিশ্রুতিশীল খাত হওয়া সত্ত্বেও রাজস্ব সংগ্রহের দিক হতে এ খাতের অবদান খুবই কম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। অথচ মোট কর রাজস্বে কৃষি খাতের অবদান মাত্র ৩ থেকে ৫ শতাংশ। তাই কৃষি খাতে আরোপিত আয়কর ও ভূমি রাজস্ব যদি সামগ্রীক অর্থে প্রগতিশীল করা যায় তাহলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশের পরোক্ষ কর ব্যবস্থায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রয় করা, বাণিজ্য শুল্ক, আবগারী শুল্ক প্রগতিশীল হারে বসানো উচিত। প্রশাসনিক দুর্বলতাহেতু বাংলাদেশ সরকার বাণিজ্য হতে প্রচুর পরিমাণ কর রাজস্ব লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের আমদানী শুল্ক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা হল কর আদায়ে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আদায় সম্ভব।

পঞ্চমতঃ দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি আমাদের সমাজের শাখায় প্রশাখায় বিস্তৃত। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা খুব বেশী। প্রশাসনিক দুর্বলতাহেতু বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ কর ও রাজস্ব আদায়ে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থায় আমাদের দেশে একটি দক্ষ, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী প্রশাসনিক কর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনকে প্রয়োজনে কর আদায়ে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশের ন্যায় একটি অনুন্নত দেশে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথোপযুক্ত করনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দেশের উৎপাদন, জাতীয় আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি খাত যেন একসঙ্গে বৃদ্ধি পায় অথচ দেশে যাতে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ রেখে সরকারের কর নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আর এ জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহ নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।

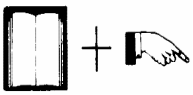

অনুশীলন : এগুলো ছাড়া আরও অন্য কোন পদক্ষেপ আছে বলে কি আপনার মনে হয়। থাকলে সেগুলো লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কর কাকে বলে ? উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

২। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। বাংলাদেশের কর কাঠামো কি আপনার মতে সন্তোষজনক। যদি না হয় তবে বাংলাদেশের কর কাঠামোর কি কি পরিবর্তন করা যেতে পারে – তা বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশের কর কাঠামোতে কোন্ করের অংশ খুবই কম –

ক) পরোক্ষ করের　　খ) প্রত্যক্ষ করের

গ) মূল্য সংযোজন কর　　ঘ) কোনটিই নয়।

২। বাংলাদেশের কর রাজস্বে কৃষির অবদান শতকরা –

ক) ৫ ভাগ　　খ) ৬ ভাগ

গ) ৭ ভাগ　　ঘ) ২ ভাগ

৩। কোন কর অধিক প্রগতিশীল ও নমনীয়-

ক) প্রত্যক্ষ কর　　খ) পরোক্ষ কর

গ) মূল্য সংযোজন কর　　ঘ) আয়কর।

৪। মোট সরকারী রাজস্বের কত শতাংশ কর থেকে আসে ?

ক) ৬০ শতাংশ　　খ) ৭০ শতাংশ

গ) ৮০ শতাংশ　　ঘ) ৯০ শতাংশ

সমস্যা :

ধরুন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। সরকারী রাজস্বের খুবই শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় আপনাকে কর ও রাজস্ব বোর্ডের প্রধান করা হল। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন এবং বর্তমান কাঠামোতে কি কি পরিবর্তন সাধন করবেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ - ৪ : বাংলাদেশের বাজেট ঃ রাজস্ব ও মূলধনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাজেটের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজেটের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের বাজেটের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন
- রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন
- অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- এই বাজেটের আয় ও ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা :

বাংলাদেশের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে চলুন আমরা জেনে নেই বাজেট কাকে বলে? মনে করুন আপনার বাবা মাসের প্রথম তারিখে আপনাকে পাঁচশত টাকা দিল ১ মাসের হাত খরচ হিসেবে। টাকাটা হাতে পাওয়ার পর নিশ্চয় আপনি পরিকল্পনা করবেন কিভাবে এই পাঁচশত টাকা ১ মাসে খরচ করবেন। বাজেট আসলে এই পরিকল্পনার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তদ্রুপ আধুনিক রাষ্ট্রে প্রতিটি সরকারকেই বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে এবং কোন কোন উৎস হতে এই অর্থ সংগৃহিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এই লিপিবদ্ধ বিবরণটিই বাজেট নামে পরিচিত। ১৭৩৩ সালে বৃটিশ অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় সর্বপ্রথম বাজেট পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন। চামড়ার একটি ব্যাগে করে তিনি অর্থ সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে উহা অনুমোদনের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে যেতেন। সেই থেকে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাজেটে শুধু সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবই থাকে না; বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও রাজস্বনীতির প্রতিফলন ঘটে। আধুনিককালে বাজেট যেকোন দেশের জন্য অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সংক্ষেপে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত: ১ বছরে সরকারের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আর্থিক লেনদেনের যাবতীয় বিবরণ যে দলিলে লিপিবদ্ধ তাই বাজেট হিসেবে গণ্য।

এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চই আপনারা উপলব্দি করতে পেরেছেন যে, বাজেট আসলে নিছক সংখ্যাতত্ত্বের দলিল মাত্র নয়। এটিকে আমরা সরকারী আয় ব্যয় সম্পর্কিত মাষ্টার প্লানও বলতে পারি।

বাজেটের গুরুত্ব : এখন চলুন, আমরা বাজেটের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করি। আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের মোক্ষম দলিল হল বাজেট। এ মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনীতিতে নিয়োগ বৃদ্ধি করা। উন্নয়নশীল দেশে কাঙ্ক্ষিত স্তরে বিনিয়োগ পৌঁছানোর জন্য বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের কাম্য বন্টনে বাজেটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বাজেট প্রণয়নের সময় এমনভাবে উহার কর ও ব্যয়নীতি নির্ধারণ

করে যাতে দেশের প্রাপ্ত সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাত হতে উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় এবং দেশের প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এতে করে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভুত হতে পারে না। বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হল বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাণিজ্যচক্রের তেজীভাবের সময় অতিরিক্ত কর ধার্য ও সরকারী ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাবের সময় মুদ্রাসংকোচন দেখা দেয়, ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায় ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় সরকার ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাব দূর করতে পারে। এভাবে বাজেট সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এখন চলুন বাজেটের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বাজেটের প্রকারভেদ : আয় ব্যয়ের সমতার ভিত্তিতে বাজেটকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. সুষম বাজেট
২. অসম বাজেট

সুষম বাজেট : যে বাজেট প্রস্তাবিত আয় ও ব্যায়ের পরিমাণ সমান হয় তাকে সুষম বাজেট বলে। এ নীতি অনুসারে বাজেট প্রণয়ন করলে সরকারের পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভবপর হয়। এতে মুদ্রাস্ফীতির কোন আশংকা থাকে না। সুষম বাজেট সমাজে আয় বৈষম্য হ্রাস করে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করে।

অসম বাজেট : যে বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় না, তাকে অসম বাজেট বলে। অসম বাজেট আবার দুই প্রকার। যথা –
ক. উদ্বৃত্ত বাজেট
খ. ঘাটতি বাজেট

উদ্বৃত্ত বাজেট : যে বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশী হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

ঘাটতি বাজেট : যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী ধরা হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলে ঘাটতি বাজেট অনুসরণ করা উচিত। অর্থনৈতিক মন্দার সময় ঘাটতি বাজেট এবং সমৃদ্ধির সময় উদ্বৃত্ত বাজেট দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর বজায় রাখা সম্ভব। ঘাটতি বাজেটের ফলে একদিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি দেশের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ঘাটতি বাজেটের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্য সুষম বাজেট অপেক্ষা ঘাটতি বাজেট অধিকতর ফলপ্রসূ।

আয়-ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. রাজস্ব বাজেট ও
২. মূলধনী বাজেট

রাজস্ব বাজেট : এ বাজেটে সরকারের চলতি বছরের আয় ও ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসাব-নিকাশ উল্লেখ করা হয়। এ বাজেটের দু'টি অংশ
ক. আয়ের উৎস
খ. ব্যয়ের উৎস

আয়ের অংশে সরকারের সম্ভাব্য মোট আয় উল্লেখ করা হয় এবং কোন কোন উৎস হতে এ আয় আসবে তা বর্ণনা করা হয়। মূলত: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ফি, সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতি উৎস থেকে এ আয় হয় এবং তা প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বেসামরিক প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি খাতে ব্যয় হয়।

মূলধনী বাজেট : সরকার কর্তৃক গৃহিত বার্ষিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব এ বাজেটে দেখানো হয়। পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের অর্থ যে বিভিন্ন দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহিত হবে তাও দেখানো হয়। পরিশেষে মূলধন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় বলে একে উন্নয়ন বাজেটও বলা হয়।

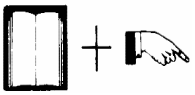

অনুশীলন : রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট কি একে অপরের পরিপূরক বলে আপনার মনে হয় ?

এবার চলুন বাজেটের শ্রেণী বিভাগকে একটি ছকের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করি।

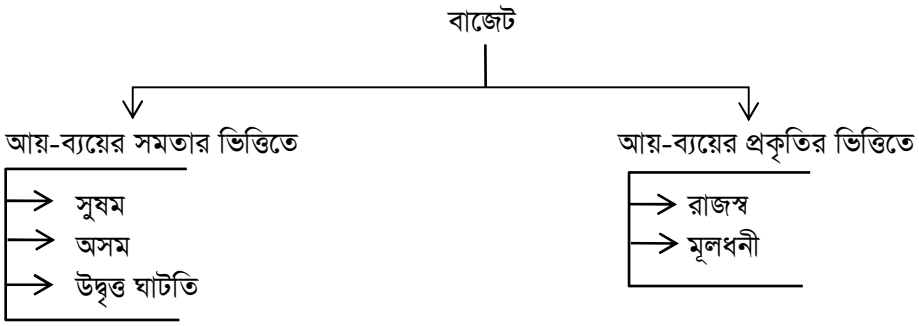

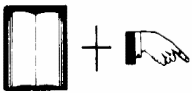

অনুশীলন : বাজেটের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।

বাজেটের শ্রেণী বিভাগ এবং রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা জ্ঞান লাভ করলাম। এবার চলুন একটু দেখা যাক বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো কি কি?

রাজস্ব বাজেট

আয়ের উৎস	ব্যয়ের উৎস
(ক) **কর থেকে প্রাপ্তি**	১. সরকারে অঙ্গ সমূহ
১. বহিঃ শুল্ক	২. বিচার ব্যবস্থা
২. আবগারী শুল্ক	৩. হিসাব নিরীক্ষা
৩. আয়কর	৪. রাজস্ব সর্ম্পকীয় কাজ
৪. বিক্রয় কর	৫. সচিবালয়
৫. সংযোজন কর	৬. বৈদেশিক বিষয়াবলী
৬. ভূমি রাজস্ব	৭. সাধারণ প্রশাসন
৭. সম্পূরক শুল্ক	৮. পুলিশ ও আনসার
৮. নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প	৯. বাংলাদেশ রাইফেলস্
৯. যানবাহন আয়	১০. সাধারণ কার্যক্রম
১০. রেজিষ্ট্রেশন	১১. প্রতিরক্ষা
১১. মাদক শুল্ক	১২. শিক্ষা
১২. অন্যান্য কর ও শুল্ক	১৩. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
	১৪. অবসর ভাতা
(খ) **কর বর্হিভূত প্রাপ্তি**	১৫. সমাজকল্যাণ কাজ
১. সরকারী আর্থিক প্রতিঃ সমূহ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৬. সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যাবলী
২. সরকারী অ-বার্ষিক প্রতিঃ সমূহ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৭. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম
৩. সুদ হতে প্রাপ্ত আয়	১৮. শিল্প ও খনিজ
৪. অর্থনৈতিক সেবা	১৯. পানি ও এনার্জি
৫. সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	২০. পরিবহন ও যোগাযোগ
৬. যমুনাসেতু সারচার্জ ও লেভী	২১. সাহায্য, মঞ্জুরী ও চাঁদা
৭. টিএন্ডটি বিভাগ	২২. অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ
৮. ডাক বিভাগ	২৩. বৈদেশিক ঋণের সুদ
৯. রেলওয়ে	২৪. অপ্রত্যাশিত ব্যয়।
১০. কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	
১১. সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	
১২. যোগাযোগ ও পরিবহন	
১৩. অন্যান্য কর বর্হিভূত রাজস্ব	
১৪. মূলধন উদ্ভুত রাজস্ব	
১৫. সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহন ইত্যাদি।	

মূলধনীবাজেট

আয়ের উৎস	ব্যয়ের উৎস
(ক) **অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি**	১. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন
১. রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২. পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
২. খাদ্য হিসাব থেকে নিট সম্পদ	৩. শিল্প
৩. নীট মূলধন প্রাপ্তি	৪. বিদ্যুৎ
৪. স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নিজস্ব তহবিল	৫. প্রাকৃতিক সম্পদ
৫. নতুন ব্যবস্থা	৬. পরিবহন ও যোগাযোগ
	৭. ভৌত পরিকল্পনা পানি সম্পদ ও গৃহায়ন
(খ) **বৈদেশিক উৎস**	৮. শিক্ষা, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
১. প্রকল্প সাহায্য	৯. জন প্রশাসন
২. অপ্রকল্প সাহায্য	১০. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৩. পি এল ৪৮০	১১. শ্রম ও জনশক্তি
	১২. জেলা ও থানা অবকাঠামো উন্নয়ন
	১৩. অন্যান্য।

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট

অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ.এম.এস কিবরিয়া গত ১১ই জুন ১৯৯৮ তারিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের জন্য ৩৫০ কোটি টাকার নতুন কর ধার্য করে সর্বমোট ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে গৃহীত কর কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে দেশে সকল প্রকার কসমেটিক্স, টয়লেট্রিজ, ঘটি, সিমেন্ট, সিরামিক, মেলামাইন, তৈজসপত্র, সিআইশীট, ফোম, সিগারেট, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, কার্পেটসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, সিকিউরিটি সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক বিক্রয় কেন্দ্র, ট্রেড সার্ভিস, ট্রাভেল এজেন্সীকে ভ্যাটের আওতায় আনায় এসব খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে কম্পিউটার, পলিথিন, প্লাষ্টিক পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে কৃষি নির্ভর শিল্প, চামড়া শিল্প ও বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের উপর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে আশ্রয়হীন নারী-শিশুসহ প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৮ কোটি টাকার একটি সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছ। বাজেটে শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করার জন্য একটি সহায়তা কর্মসূচী ও প্রস্ত াব করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যে ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছেন তাতে –

- রাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৯ শত ৩৭ কোটি টাকা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকা
- মূলধন খাতে ব্যয় ৭ শত ৬০ কোটি টাকা
- খাদ্য বাজেটে ব্যয় ২ শত ৩৯ কোটি টাকা

এর সাথে ঋণ ও অগ্রীম বাবদ ৪ শত ৪০ কোটি টাকার সমন্বয় করে উল্লেখিত ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার সামগ্রীক ব্যয় কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে রাজস্ব খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৭ শত ৭৬ কোটি টাকা এই হিসেবে সামগ্রীক বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৯ হাজার ৩শত ২০ কোটি টাকা। তাই বাজেটে নিম্নলিখিত খাত থেকে ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- অতিরিক্ত বাজেটারী সম্পদ থেকে ১শত ৮৪ কোটি টাকা।
- টিএন্ডটি বন্ড থেকে ১৫০ কোটি টাকা
- প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব থেকে ৩ হাজার ৩ শত ৯৩ কোটি টাকা
- মেয়াদী ঋণ বাবদ ৩শত ১৪ কোটি টাকা।
- অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ৩ হাজার ৪ শত ১৩ কোটি টাকা
- দশিক সাহায্য খাত থেকে ৫ হাজার ৯ শত ৭ কোটি টাকা

প্রস্তাবিত বাজেট আগামী অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়নি। তবে অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশ ভাগে গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সর্বাধিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে ৪ হাজার ৫ শত ৯৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

শিক্ষার্থীরা এখন চলুন আমরা বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো আলাদা আলাদা ভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি।

রাজস্ব বাজেট

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাত থেকে সর্বমোট আয় ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৭ শত ৭৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে –

- কর খাত থেকে আসবে ১৬ হাজার ৬ শত ১৭ কোটি টাকা।
- কর বহির্ভূত খাত থেকে আসবে ৪ হাজার ১ শত ৫৯ কোটি টাকা

কর খাত থেকে প্রাপ্ত টাকার-

- ৭ শত কোটি টাকা আসবে জাতীয় রাজস্ববোর্ডের আওতাধীন কর থেকে এবং বাকী
- ১৭ কোটি টাকা আসবে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কার্যক্রম থেকে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর থেকে ৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা, আমদানী শুল্ক থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক থেকে ২ হাজার ৭ শত কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ভ্যাট এর আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৯ শত ৩৭ কোটি টাকা। এই আয় ও ব্যয়ের হিসাব সমন্বয়ের পর রাজস্ব উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে ৪ হাজার ৮ শত ৩৯ কোটি টাকা।

উন্নয়ন বাজেট

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ১৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মোট অর্থের ৬ হাজার ২ শত ১৮ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং বাকি ৭ হাজার ৩ শত ৮২ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে বৈদেশিক সাহায্য খাত থেকে।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে

- রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে ৪ হাজার ৮ শত ৩ কোটি টাকা
- অভ্যন্তরীণ মূলধন থেকে ১ হাজার ২ শত ৮৪ কোটি টাকা
- টিএন্ডটি বন্ড থেকে ১শত ৫০ কোটি টাকা
- স্বায়ত্তশাসিত নিজস্ব সম্পদ থেকে ১ শত ৮৪ কোটি টাকা
- খাদ্য বাজেট থেকে ২শত ৩৯ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে।

বৈদেশিক উৎসের মধ্যে

- প্রকল্প সাহায্য থেকে ৫ হাজার ৮ শত ২ কোটি টাকা
- পণ্য সাহায্য থেকে ৮ শত ৯৪ কোটি টাকা
- খাদ্য সাহায্য থেকে ৬ শত ৮৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

এডিপি-তে নিম্নলিখিত খাতগুলোতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে –

- সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে স্থানীয় সরকার খাতে ২ হাজার ২৫ কোটি টাকা।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ খাতে ১ হাজার ৯ শত ৮২ কোটি টাকা।
- সড়ক ও রেলপথ খাতে ১ হাজার ৬ শত ৪৩ কোটি টাকা।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে দেয়া হয়েছে ৯ শত ২১ কোটি টাকা।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা খাতে দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৩ শত কোটি টাকা।

এক নজরে ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট

সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	বাজেট ১৯৯৮-৯৯	সংশোধিত বাজেট ১৯৯৭-৯৮	১৯৯৭-৯৮
১	রাজস্ব প্রাপ্তি	২০,৭৭৬	১৮,৭৭৭	১৯,৬২৪
	বাদ ঃ ব্যয়	১৫,৯৩৭	১৪,৫০০	১৪,৫৪৪
২	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৪,৮৩৯	৪,২৭৭	৫,০৮০
	যোগ ঃ বৈদেশিক মঞ্জুরী	২,৯৯০	২,৮৮৬	২,৯৮৭
	উপমোট	৭,৮২৯	৭,১৬৩	৮,০৬৭
৩	বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি	৪,৩৯২	৩,৮১৮	৩,৮৩০
	উপমোট	৪,৩৯২	৩,৮১৮	৩,৮৩০
৪	অভ্যন্তরীণ মূলধন বৃদ্ধি (হ্রাস)	১,২৮৪	১,১৬২	৫৬৭
		১৫০	১১১	১৫০
	উপমোট	১,৪৩৪	১,২৭৩	৭১৭
৫	অভ্যন্তরীণ সম্পদ	০	০	২৬৫
	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থযোগান	১৮৪	১৭০	১৭৫
	মোট সম্পদ প্রাপ্তি সম্পদের ব্যবহার	১৩,৮৩৯	১২,৪২৪	১৩,০৫৪
৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১৩,৬০০	১২,২০০	১২,৮০০
	খাদ্যের জন্য নীট ব্যয় বরাদ্দ	২৩৯	১৯৯	২১৬
	নতুন এডিপি প্রকল্প	০	২৫	৩৮
	উপমোট	১৩,৮৩৯	১২,৪২৪	১৩,০৫৪

(সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ)

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আজকের বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় উট পাখির মত মাথা গুজে থাকা সম্ভব নয়। আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় অতিক্রম করছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এশিয়ার অর্থনৈতিক বির্পযয়ের অশনি সংকেত এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। আমাদের লোকসানকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রূপকথার মৃত পাখির মত আমাদের গলায় অভিশাপ হিসেবে ঝুলে আছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এসব সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করে টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে পারব।

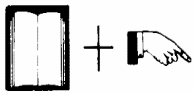

অনুশীলন : বাংলাদেশে ১৯৯৮-৯৯ এর জাতীয় বাজেটে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। উল্লিখিত বাজেটে বিশেষ অর্জনগুলো কি কি? বাজেটে প্রাক্কলনগুলোর সাথে অর্জনসমূহের তুলনা করুন। কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা থেকে থাকে তাহলে এর কারণ ব্যাখ্যা করুন। ১৯৯৮-৯৯ এর পরবর্তী অর্থ বছরগুলোর বাজেটও একইভাবে পর্যালোচনা করুন। বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাজেটের সাথে কি কি মৌলিক বিষয় যোগ হয়েছে তা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বাজেটের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। বাজেটের শ্রেণী বিভাগ করুন এবং এর প্রত্যেকটির বর্ণনা দিন।

৩। রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট কাকে বলে ? বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো লিখুন।

৪। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। যে বাজেট ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশী তাকে-
ক) উদ্বৃত্ত বাজেট বলে খ) ঘাটতি বাজেট বলে
গ) সম্পূরক বাজেট বলে ঘ) সুষম বাজেট বলে

২। অর্থনৈতিক মন্দার সময় কোন বাজেট দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বজায় রাখা যায়-
ক) উদ্বৃত্ত বাজেট খ) ঘাটতি বাজেট
গ) সম্পূরক বাজেট ঘ) কোনটি নয়

৩। উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোন বাজেট বেশী উপযোগী ?
ক) সুষম বাজেট খ) উদ্বৃত্ত বাজেট
গ) রাজস্ব বাজেট ঘ) ঘাটতি বাজেট

৪। আয়-ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
ক) সুষম ও অসম বাজেট খ) উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট
গ) কোনটাই নয়

সমস্যা :

ধরুন, কোন অর্থবছরে একটি সরকার তার উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং তার রাজস্ব আয় ৯৫০০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ৩৫০০ কোটি টাকা। এখন বলুন –

ক) সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

খ) সরকার কিভাবে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করবে।

গ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে কোন উপায়ে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করা উচিত।

ঘ) সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্ত আছে কি ? যদি থাকে তবে তার পরিমাণ কত ?

ঙ) যদি সরকারী শুল্ক ২% হ্রাস করা হয়। তবে সরকারী আয়-ব্যয়ে তার কি প্রভাব পড়ে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালা

পাঠ- ১	ঃ	১ (ক)	২ (খ)	৩ (ঘ)	৪ (খ)
পাঠ- ২	ঃ	১ (গ)	২ (খ)	৩ (ক)	৪ (খ)
পাঠ- ৩	ঃ	১ (খ)	২ (ক)	৩ (ক)	৪ (গ)
পাঠ- ৪	ঃ	১ (ক)	২ (খ)	৩ (ঘ)	৪ (গ)